Vol. 58 | No. 3 | 2023

Check for updates

# সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

## সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগল্পে দৃষ্টিপাতের ভাষা


| | |
|---|---|
| Volume | 58 |
| Issue | 3 |
| Year | 2023 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | Syed Shahrier Rahman |
| Published online | June 1, 2023 |
| DOI | 10.62328/sp.v58i3.3 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v58i3.3 |
| Pages | ৪১-৫১ |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

# সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগল্পে দৃষ্টিপাতের ভাষা

Check for updates

সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান


## সাহিত্য পত্রিকা

Shahitto Potrika
eISSN 3006-886X
ISSN 0558-1583
Volume 58
Number 3

সাহিত্য পত্রিকা (২০২৩) ৫৮ (৩): ৪১-৫১
DOI 10.62328/sp.v58i3.3

সাহিত্য পত্রিকা
বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ ৫৮ ॥ সংখ্যা ৩ ॥ আষাঢ় ১৪৩০ ॥ জুন ২০২৩

# সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগল্পে দৃষ্টিপাতের ভাষা

## সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান*

**সারসংক্ষেপ:** সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগল্পে বিধৃত বিভিন্ন চরিত্র চোখের চাহনিতে কীভাবে আবেগ ও অনুভবকে লালন করে, প্রকাশ করে কিংবা অপ্রকাশিত রেখে পাঠককে রহস্যভেদ করার আনন্দে উদ্দীপিত করতে উদ্যোগী হয় – সেইসব মাত্রাবহুল দৃষ্টিপাতের বিশ্লেষণ বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য। এতে লেখকের ছোটগল্প থেকে নির্বাচিত কয়েকটির পাঠ এই বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কেবল উপস্থাপিত গল্পসমূহেই এই নান্দনিক কৌশল প্রয়োগ করেছেন; তবে, বিশ্লেষিত গল্পপাঠের সূত্রে দৃষ্টিপাতের ভাষা সৃজনে তাঁর শৈল্পিক দক্ষতা অনুধাবন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

আলোকিত পৃথিবীকে চোখ মেলে দেখার সাধারণ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে মানুষ তার আপেক্ষিক বোধের শক্তিতে আবেগ, জীবনদর্শন, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সঙ্গে সমন্বিত করার সামর্থ্য রাখে । মানবদৃষ্টি তাই প্রায়শই অনুভব আর প্রকাশের ব্যবধানকে এক রহস্যময় উভমুখী সমীকরণে ধারণ করতে সচেষ্ট হয়। এই প্রচ্ছন্ন ও গোপনীয়তাপ্রিয় মিথস্ক্রিয়া কখনো কখনো হয়ে উঠতে পারে মানবের মনোমুক্তির অতিআকাঙ্ক্ষিত অলিন্দ। অর্থাৎ, ভাষিক সংজ্ঞাপনে যা প্রকাশযোগ্য হয় না, অ-ভাষিক চোখের চাহনিতে সেই রুদ্ধ অপ্রকাশ ভারমুক্ত হতে সচেষ্ট হয়। মানবদৃষ্টির বহুদ্যোতনাকে কথাসাহিত্যিক তাঁর কথা-প্রকাশের এক গভীরতাসঞ্চারী এবং চির-অভিনব উপায় রূপে ব্যবহার করে থাকেন; নির্মীয়মাণ চরিত্রের প্রকাশ এবং অপ্রকাশের মধ্যে অনির্বচনীয় সংযোগ-সেতু রচনা করেন। একটি ভিন্নধর্মী দৃষ্টান্তের সহায়তা নেওয়া যাক। বুদ্ধদেব বসু রচিত *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকে ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাতের মধ্য দিয়ে তরঙ্গিণীর হৃত প্রত্ন-অপাপবিদ্ধ রূপের পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টা ও কামনা পেরোনোর অনুভব; অপরদিকে তরঙ্গিণীর প্রতি দৃষ্টিপাতের সূত্রে ঋষ্যশৃঙ্গের তাকে কামনাদগ্ধ করার আকাঙ্ক্ষা – এই দুই বিপ্রতীপ আবেগের প্রকাশ নিহিত রয়েছে তাদের পরস্পরের প্রতি চাহনির মধ্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য (ভীষ্মদেব, ২০১৩:১০৪):

> নাটকটিতে ওই দুই-মুহূর্তেই নাট্যরস সৃজিত হয়েছে নায়ক-নায়িকার লক্ষ্যভেদী দৃষ্টিপাতে। নাট্যকার সচেতনভাবেই এই দুটি ক্ষেত্রে নায়ক-নায়িকার সংলাপ ব্যবহার করেননি; পরস্পরের উদ্দেশে তাঁরা যখন সংলাপ উচ্চারণ করেছে, তার পূর্বেই তৈরি হয়ে গেছে নাটক, উৎসারিত হয়েছে নাট্যরস। বুদ্ধদেব তাঁর প্রদত্ত পরামর্শে প্রসাধন বিষয়ক নির্দেশনায় প্রসঙ্গক্রমে বিষয়টির অবতারণা করেছেন এবং সুনির্দিষ্ট অভিমত ব্যক্ত করে লিখেছেন – 'তরঙ্গিণী ও ঋষ্যশৃঙ্গের চক্ষু যতদূর সম্ভব পরিস্ফুট করে তোলা বাঞ্ছনীয়, কেননা এই দু-জনের দৃষ্টিপাত অভিনয়ের একটি অংশ।'

---

* অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বস্তুত নাট্যকার এখানে তরঙ্গিণী এবং ঋষ্যশৃঙ্গের হৃদয়ের রসায়নকে দৃষ্টিপাতসূত্রে অভিনয়কলার অংশ করতে চেয়েছিলেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এক্ষেত্রে আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে ছোটগল্পের আখ্যান পরিসরেই সৃষ্ট চরিত্রসমূহের দৃষ্টিপাতকে গভীর সংবেদনায় ব্যবহারের সচেতন প্রয়াস চালিয়েছেন। সুতরাং, ওয়ালীউল্লাহ্‌র চরিত্ররা কীভাবে তাকায়, চোখের ভাষায় কী বলে যায়, কিংবা কী আর কখনোই বলা হয় না, সব মিলিয়ে কেমন তাদের দৃষ্টিপাতের ভাষা – নির্বাচিত কয়েকটি গল্পের সীমায় এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করা যেতে পারে। বলা প্রয়োজন যে, প্রচল অর্থে পয়েন্ট অব ভিউ বা দৃষ্টিবিন্দু বিশ্লেষণ বর্তমান প্রবন্ধের অভীষ্ট নয়। একটি গল্প সর্বজ্ঞ দৃষ্টিবিন্দুতে, লেখকের নিজ জবানিতে কিংবা একাধিক দৃষ্টিবিন্দুর সমন্বয় ঘটিয়ে রচিত হতে পারে। কিন্তু গল্প-বিশেষে বিবরণ উপস্থাপনের সূত্রে মানব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিচলন ব্যাখ্যাত হয়ে থাকে; চোখের ভূমিকা এক্ষেত্রে আরো বেশি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। বলা চলে, সর্বাধিক সূক্ষ্ম দ্যোতনা নিয়ে গল্পের রসবোধকে গভীর করে তোলে দৃষ্টিপাতের ভাষা। এ দিক থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পে দৃষ্টিপাতের ভাষার তাৎপর্য নিরূপণ করা বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য।

## ১

শিশুর চোখের ভাষা আর মুখের ভাষার মধ্যে হয়ত তাৎপর্যপূর্ণ কোনো ব্যবধান থাকে না। কিন্তু সমাজ-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশুর বিকাশের ধারাবাহিকতায় এই ব্যবধান বাড়তে থাকে এবং সমাজের বেঁধে দেওয়া ঔচিত্যবিধি শিখে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকে সুবোধ, সুরুচি তথা কাম্য পরিশীলনে আচ্ছাদিত করে শিশুটি তার মুক্ত প্রকাশকে মনোবন্দি করে। ফ্রয়েডীয় চিন্তাজালে না জড়িয়েও এ কথা বলা চলে যে, শিশুটি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠতে উঠতে এই অবদমন কৌশলগুলো ভালোভাবেই আয়ত্ত করে এবং ভাষিক সংজ্ঞাপন থেকে প্রায় সবটুকু আড়াল করার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকে। কিন্তু তারপরও তার চোখ কথা বলে, এমন অনেককিছুর অব্যক্ত প্রকাশ ঘটে যারা কখনোই তার ঠোঁট ছুঁয়ে উঠতে পারে না। এরকমই একজন যখন ছোটগল্পের চরিত্র হয়ে ওঠে, তখন তার অব্যক্ত অথচ দ্যোতনাময় চাহনিকে গল্পের প্রয়োজনে ব্যবহার করাটাই নান্দনিকভাবে প্রত্যাশিত। এই প্রত্যাশা পূরণে ওয়ালীউল্লাহ্‌র দক্ষতা পাঠককে কেবল বিস্মিতই করে না, পাঠকের বোধে গল্পের অসীমসংখ্যক পাঠ-সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলে।

প্রশ্ন হলো, ছোটগল্পকার ওয়ালীউল্লাহ্‌র চরিত্ররা কতটা দেখতে পায়। উপনিবেশিত জীবনবাস্তবতায় উপনিবেশ থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত দ্বিধাসন্ত্রস্ত মন নিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর চরিত্রগুলোকে কতখানি দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করে তুলতে পারেন? কেননা, মানুষ কি আদৌ পুরোটা কখনো দেখতে পায়! এই পৃথিবী, প্রকৃতি, আকাশ কিংবা সূর্যের অংশবিশেষই কেবল প্রত্যক্ষ, বাকিটা সবার কাছে বোধযোগ্য হতেও পারে আবার না-ও পারে। বোধযোগ্য হয় না বলেই হয়ত কুসংস্কার-আশ্রয়ী ধর্মান্ধতা এই মহাবিশ্ব, জীবন ও জগৎ নিয়ে নানাবিধ হেত্বাভাষের জন্ম দেয়, সেই সঙ্গে পিচ্ছিল করে দেয় অনুসারী আর ভক্তদের দৃষ্টিভাষ্য। বিশ্বাসে চোখ তখন পাথর (স্ম. লালসালু) হয়। বিশ্বাস করার এই অভ্যাস মানুষকে ক্ষীণদৃষ্টি করে। কাছের মানুষ, অনুসরণীয় মহাপুরুষ কিংবা ঈশ্বর

– সকলেই তখন বিশ্বাসের মোড়কে আবৃত; অর্থাৎ, পুরোটা দেখা অনেকেরই আর হয়ে ওঠে না। এই না-দেখা কিংবা আবছা দেখার সঙ্গে হাত মেলায় দ্বৈতদৃষ্টি (Zamir, 2012)। চক্ষুবিজ্ঞানে যাকে ডিপ্লোপিয়া বলা হয়, তাকেই প্রতীকী তাৎপর্যে দর্শনে এবং সাহিত্যে আত্তীকরণের সূত্রে খুঁজে পাওয়া যায় একাধিক দ্যোতনায় সঞ্চারিত দ্বৈতদৃষ্টি। যা মানুষ দেখছে, তা আর একক তাৎপর্যে সমীকৃত হতে পারে না, একাধিক বাগর্থ সম্ভাবনা নিয়ে সেই দৃষ্টিভাষ্য উপস্থাপিত হয় সাহিত্যে, পাঠকের দার্শনিক অনুভবে। কখনো কখনো এই একাধিক দৃষ্টিভাষ্য প্রচল কিংবা প্রচলস্পর্ধী একগুচ্ছ বিপ্রতীপ প্রতিবিম্ব আকারে মানুষের দৃষ্টিসীমায় স্থান করে নিতে চায় । সামাজিক বিধিবদ্ধ বাস্তব আর মুক্তমন অভিসারী বাস্তবতা-উত্তীর্ণ চেতনায় অন্তর্শায়িত এই প্রতিবিম্বগুলোকে ফুকো (Foucault, 1986) ব্যাখ্যা করেন হেটেরোটোপিয়া রূপে। তাঁর কাছে, কারাগার কিংবা মানসিক চিকিৎসালয় থেকে শুরু করে প্রচলিত কাঠামোর বিদ্যায়তন – সবই হেটেরোটোপিয়ার অন্তর্গত; যেখানে ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ শেষ পর্যন্ত কখনো কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আদর্শের বাহ্যিক খোলসে শৃঙ্খলিত হয় কখনো-বা সাংস্কৃতিক অতিনিয়ন্ত্রিত কাঠামোর মধ্যেই অবসিত হতে বাধ্য হয়। ফলে, আপাত অদৃশ্য অথচ সমাজে গভীরভাবে অস্তিত্বশীল এই হেটেরোটোপিয়ার ঘেরাটোপে টিকে থাকা মানুষের দ্বৈতদৃষ্টি সময়ধারায় বিক্ষেপিত হয়ে পড়ে। দ্বৈতদৃষ্টির এই বিশেষত্ব ব্যাখ্যার অংশ হিসেবে 'নয়নচারা' গল্পটিকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। উদ্বাস্তু অনাহারী আমু-র দৃষ্টিভাষ্য প্রথমে পাঠ করা যাক। উল্লেখ্য, বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত গল্পের উদ্ধৃতিসমূহ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পসমগ্র (২০১৭) থেকে গৃহীত হয়েছে। তাই নিচের প্রতিটি পাঠ-উদ্ধৃতির শেষে কেবল পৃষ্ঠা নম্বর নির্দেশ করা রয়েছে।

> সে ভরা চোখে তাকাল ওপরের পানে – তারার পানে, এবং অকস্মাৎ অবাক হয়ে ভাবল, ওই তারাগুলিই কি সে বাড়ি থেকে চেয়ে চেয়ে দেখত? কিন্তু সে-তারাগুলোর নিচে ছিল ঢালা মাঠ, ভাঙা মাটি, ঘাস, শস্য, আর ময়ূরাক্ষী। আর এ-তারাগুলোর নিচে খাদ্য নেই, দয়ামায়া নেই, রয়েছে শুধু হিংসাবিদ্বেষ নিষ্ঠুরতা, অসহ্য বৈরিতা।
> কিন্তু তবু ওরা তারা। তাদের ভালো লাগে। আর তাদের পানে চাইলে কী যেন হঠাৎ সমস্ত কিছু ছাপিয়ে বিপুল বাহু মেলে আসে, আসে – (পৃ. ৩)

আমুর 'ভরা চোখ' কি জলে ভরা? এরূপ কোনো ইঙ্গিত গল্পে নেই; তবে দৃষ্টির এই পূর্ণতায় নিহিত থাকতে পারে সাহসদীপ্ত প্রতিবাদ, ক্ষুধায় কাতর হওয়া উন্মূল জীবনেও বেঁচে থাকার অমোঘ আকাঙ্ক্ষা এবং এমন আরো অনেক কিছু। ময়ূরাক্ষী তীরের ধ্বস্ত স্মৃতি আমুর জীবনে বেশিরকম সত্য, আর অপরদিকে শহরের অমানবিকতা তার কাছে এক আকাঁড়া বাস্তব । আমু একইসঙ্গে দ্বৈতদৃষ্টিতে তার সত্য ও বাস্তবকে জীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্পেসে ধারণ করে। অনিবার্যভাবে হেটেরোটোপিয়ার আবর্তে বন্দি হয়েও সে সত্যশর্তে অস্তিত্বশীল হতে চায়। এই প্রত্যাশা প্রতি মুহূর্তেই আমুর জীবনকে বহুপর্ববিশিষ্ট করে তোলে। সে যোদ্ধার মতো এক পর্বের সংকট মোকাবিলা করে আরেক পর্বে উপনীত হয়; তার যুদ্ধের রসদ হিসেবে রয়ে যায় আত্মবিশ্বাস, জীবনাভিজ্ঞতা এবং অদম্য জীবনীশক্তি। তারপরও আমু কাতর হয়, ক্ষুব্ধ হয় – ভাঙতে চায় হেটেরোটোপিয়ার শৃঙ্খল। –

> অচেনা আকাশের তলে অচেনা সন্ধ্যায় আমুর অন্তরে একটা অচেনা মন ধীরে-ধীরে কথা কয়ে উঠছে। ক্ষীণ তার আওয়াজ, তবু মনে হয় গুহার পানে প্রবাহিত এ-বিপুল জলস্রোতকে ছাপিয়ে উঠছে তা। কী কইছে সে? অস্পষ্ট তার কথা সে-অস্পষ্টতা অতি উগ্র। মানুষের ভাষা নয়, জন্তুর হিংস্র আর্তনাদ। কী? এই সন্ধ্যা না হয় অচেনা সন্ধ্যা হল। রূপকথার সন্ধ্যা-ও তো সন্ধ্যা, কিন্তু তবু সন্ধ্যা, আর এ-সন্ধ্যায় তুমি আমাকে নির্মমভাবে কণ্টকাকীর্ণ প্রান্তরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ? কে তুমি, তুমি কে? জানো, সারা আকাশ আমি বিষাক্ত রুক্ষ জিহ্বা দিয়ে চাটব, চেটে চেটে তেমনি নির্মমভাবে রক্ত ঝরাব সে-আকাশ দিয়ে–কে তুমি, তুমি কে?
> আমুর সমস্ত মন স্তব্ধ, এবং নুয়ে রয়েছে অনুতপ্ত অপরাধীর মতো। সে ক্ষমা চায়। শক্তিশালীর কাছে সে ক্ষমা চায়। যেহেতু শক্তিশালীর অন্যায়ও ন্যায়, সে-ন্যায়ের প্রতি অন্যায় করা গুরুতর পাপ। সে পাপ করেছে, এবং তাই সে ক্ষমা চায়: দুটি ভাত দিয়ে শক্তিশালী তাকে ক্ষমা করুক। (পৃ. ৫-৬)

বিশ্বাসে বসত করা ঈশ্বরের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠা আমু সাময়িকভাবে ঈশ্বরের প্রচল ধারণাকেই গ্রাস করতে চায়। চেতন-অবচেতনে ত্রিশঙ্কুপ্রতিম অবস্থানে থেকে প্রবৃত্তির মূলীভূত শক্তি দিয়ে সে যেন ভাঙতে চায় শক্তি ও করুণার অসম্ভব-সমন্বয়প্রত্যাশী ঈশ্বরের বিভ্রান্তিভরা ইমেজ। বাস্তবতার প্রান্তরেখা ছুঁয়ে ক্ষুধার্ত আমু ঈশ্বরের কাছে নিষ্ফল প্রত্যাশার পরিণতি জেনে কিছু সময়ের জন্য ঈশ্বরকেই পূর্ণগ্রাসে নিশ্চিহ্ন করার সাহস অর্জন করে। কিন্তু প্রচল বিশ্বাস আর অনুভূতিশূন্য অমোচনীয় বাস্তবতা কৌশলে তার ক্ষোভের রূপান্তর ঘটায়। তাই ক্ষুধা নিবারণের কৌশলী শর্ত আরোপ করে আমু তার প্রতিস্পর্ধার জন্য অনুতপ্ত হয় কিংবা ছদ্ম অনুতাপে নিজেকে প্রশমন করে। এক অদ্ভুত হেত্বাভাষে সে ঈশ্বরের শক্তি ও ক্ষমায় আস্থাশীল হওয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আমুর চোখের দৃষ্টি এখন আর তাকিয়ে থাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং অন্তর্দৃষ্টির আলো জ্বালতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। নাগরিক নিষ্ঠুরতার মধ্যে সে এক দার্শনিক মীমাংসায় পৌঁছতে চায় – মানবিক বোধের মাপকাঠিতে সে মানুষকে নয়নচারা গ্রাম আর ময়ূরাক্ষী নদীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। তাই গল্পের শেষে এসে আমু যেন এক স্বয়ম্ভূ দার্শনিক; সুনির্দিষ্ট জীবনবোধে তাঁর দৃষ্টি এক গভীর অনুভবকে ভাষা দিতে চায় :

> ত্রস্তভঙ্গিতে ময়লা কাপড়ের প্রান্ত মেলে ধরে সে ভাতটুকু নিলে, নিয়ে মুখ তুলে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল মেয়েটির পানে। মনে হচ্ছে যেন চেনা-চেনা। না হলে সে চোখ ফেরাতে পারবে না কেন।
> – নয়নচারা গাঁয়ে কি মায়ের বাড়ি?
> মেয়েটি কোনো উত্তর দিলে না। শুধু একটু বিস্ময় নিয়ে কয়েক মুহূর্ত তার পানে চেয়ে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে। (পৃ.৭)

এবারের দৃষ্টিভাষ্য দ্বিমুখী। আমুর পলকহীন দৃষ্টি তার স্বোপার্জিত গ্রামমুখী জীবনদর্শনের সঙ্গে সমীকৃত হতে চায়; মেয়েটিকে নয়নচারা গ্রামের সঙ্গে যুক্ত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা সে অনুভব করে। নিজের দার্শনিক উপলব্ধিকে সত্য হিসেবে গ্রহণের আনন্দ তাকে

কিছুসময়ের জন্য হয়ত ক্ষুধাবিস্মৃত করে। কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ্ এখানে মেয়েটির দৃষ্টিভাষ্যের এক অসীম সম্ভাবনার ন্যারেটিভ তৈরিতে নিয়োজিত। মেয়েটির বিস্ময়দৃষ্টির কারণ কেবল আমুর ব্যতিক্রমী উচ্চারণ নয়; সে যেন আমুর শেকড় অভিমুখী জীবনবোধকেই প্রত্যয়ন করতে চায়। ক্ষণব্যাপী প্রায়-অনির্বচনীয় চাহনিতে মেয়েটি আমুকে আরো বেশি জীবনীশক্তি সহযোগে বাঁচার প্রেরণা যোগায়।

২

কামনা, বিস্ময় আর অচরিতার্থ আবেগে একাকার হওয়া চাহনির বর্ণনা মেলে 'পরাজয়' গল্পে। মৃতস্বামীর শব পাশে নিয়ে বসে থাকা কুলসুমের দৃষ্টি শূন্যতা আর বিস্ময়ে ভরা। সর্পাঘাতে নিহত স্বামীকে নিয়ে বেহুলার মতো ভেসে যাওয়ার পরিকল্পনা করে, আবার এই সংকটময় পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের আশায় মজনু এবং কালুর উপস্থিতিকেও ঐশ্বরিক আশীর্বাদ ভেবে আপ্লুত হয়। তার দেহের প্রতি মজনুর কামনাতপ্ত দৃষ্টিকে সে ব্যতিক্রমী নিস্পৃহতা দিয়ে আটকে রাখতে চায়:

> মজনু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল কুলসুমের পানে, তার মুখে ঘোমটা নেই, স্থির চোখে অদ্ভুত স্তব্ধতা। কালো-কালো ডাগর চোখের ছায়ায় ওর মুখটি ভারি স্নিগ্ধ ও কোমল দেখায় বলে মজনু বলে যে, সে কোন অচিন দেশের রাজকন্যা, যার রূপ নীল আকাশের পরীর মতো, চুল মেঘের মতো, আর দেহের রং সোনার মতো। কিন্তু সে-চোখে কী স্তব্ধতা এখন। তবু কৌতুক বোধ করল সে। মাথাটা একটু হেলিয়ে কিছু আড়চোখে কুলসুমের পানে তাকিয়ে এবার সে হাসল, নিচু গলায় সঙ্গোপনে বললে:
> – অমন থির হইয়া বইসা ক্যান্ গো রাজকইন্যা, ছোট্ট নাকের ছোট্ট নথটাও যে নড়তাছে না। দুই জনে বুঝি হইছে একচোট?
> এবার কুলসুমের স্থির স্তব্ধ চোখ একটু নড়ে উঠল, সে মুখ ফিরিয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাষাশূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মজনুর পানে, তারপর ঝরা শুকনো পাতার মতো স্পষ্ট শুষ্ককণ্ঠে বলে উঠল:
> – কাটি ঘায়ে মরছে সে। (পৃ. ১৬)

দৃষ্টির এখানে অনেক রকমফের। মজনুর দৃষ্টি একরৈখিক; অবদমিত কামতৃষ্ণায় উত্তেজিত। তার কোনো সোজা সাপটা চাহনি এতে নেই। আড়চোখে কুলসুমের দিকে তাকানো যেন তার কামাতুর অথচ দুর্বল ক্ষীয়মাণ ব্যক্তিত্বেরই দ্যোতক। সদ্যপতিহারা কুলসুমের নীরবতা তাকে সন্দিগ্ধ করে বটে, কিন্তু কুলসুমের শরীরী আকর্ষণের কাছে তা অর্থশূন্য হয়ে ওঠে । রূপজ মোহে আক্রান্ত মজনুর দৃষ্টিসীমার বাইরে রয়ে যায়, কুলসুমের রংহীন মন, নিরলংকার অভিব্যক্তি। সচেতনভাবেই ওয়ালীউল্লাহ্ মজনুর ক্ষেত্রে কোনো দ্বৈতদৃষ্টি প্রয়োগের কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে পান না। কুলসুমের সধবা জীবনের চিহ্ন নাকের নথ ছমিরের স্থির মৃতদেহের মতো অনড় হয়ে রইলেও তা মজনুর স্তরহীন বোধে কোনো সংবেদন জাগায় না। কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ্ দ্বৈতদৃষ্টির স্পর্শে বহুমাত্রিক করে তুলতে চান কুলসুমকে। তাই তার দৃষ্টি মজনুর কথায় ভাষাশূন্য হয়। অপ্রকাশে ভারাক্রান্ত কুলসুম

অত্যন্ত সংক্ষেপে ছমিরের মৃত্যুসংবাদ মজনুকে জানায়। কুলসুম এবং ছমিরের দাম্পত্য জীবন কেমন ছিল তা গল্পে উপস্থাপিত হয়নি। বেহুলার মতো হতে চাওয়ার মধ্যেও কুলসুমের নিবিড় ভালোবাসা না-কি মেলোড্রামাধর্মী অতি-আবেগ কাজ করেছে – তা-ও অজ্ঞাতই রয়ে যায়। কিন্তু যা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো কুলসুমের অনিঃশেষ শূন্যতা। মজনুর অভিব্যক্তিতে কুলসুমের শরীরী সৌন্দর্যের প্রকাশও বিপরীতক্রমে তার এই চারিদিক শূন্য হয়ে যাওয়া অনুভূতি আরো বেশি উপলব্ধিনিবিড় করে তুলেছে। মজনুর কামজ দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়েছে কালুও। তাই কালু যেন ব্যক্তিগত ঈর্ষা গোপন করে মজনুর না বলতে পারা বিবাহ-প্রস্তাব কুলসুমের সামনে উপস্থাপন করে নিজের অবদমিত কামকেই সে আরও জাগিয়ে তুলতে চায়। প্রসঙ্গত:

> হাসি থামলে আড়চোখে কুলসুমের পানে চেয়ে সে [কালু] বললে:
> –তর যা রূপ, আজরাইলে পর্যন্ত দেইখা পাগল হইব রে। হগ্‌গলেই তর লাইগা পাগল। আম্‌গো মজনু মিঞা –
> থেমে গিয়ে তেমনি কণ্ঠে আবার সে হাসতে লাগল। তার যেন নেশা পেয়েছে, ছোট ঘোলাটে চোখে ঘোর লেগেছে।
> কেউ কিছু আর বললে না, শুধু মুখ ফিরিয়ে কুলসুম একবার কালুর পানে তাকাল: তার শান্ত স্তব্ধ ডাগর চোখে কিছুটা বিস্ময়ের ছায়া। মজনু মুখ তুলল না, নীরবে ধুঁয়ো ছাড়তে থাকল। তবু থেকে থেকে গলায় বিকৃত আওয়াজ করে কালু হেসে উঠতে লাগল, আর বারে-বারে কুলসুমের পানে তাকাতে-তাকাতে একবার জিহ্বা দিয়ে ঠোঁটটা চেটে নিল।
> শেষে একসময়ে বললে:
> – তরে – বুঝলি – তরে মজনু এইবার বিয়া করব। সেই আশাতেই তো সে আছিল এ্যাদ্দিন – (পৃ. ১৯)

কামনার ঘোর কালুর দৃষ্টিতে, ঈর্ষার প্রকাশ তার প্রতিটি উচ্চারণে। বিশেষ করে জিভ দিয়ে ঠোঁট লেহন করার মধ্য দিয়ে তার যৌনাকাঙ্ক্ষা তীব্রতার সর্বোচ্চ সীমা স্পর্শ করে। মজনুর বিয়ের ঘোষণা সে-ই উচ্চারণ করে বটে, কিন্তু তা পরাজয় মেনে নেওয়ার গ্লানিতে অবসন্ন। কামনার এই উত্তাপ কালু এবং মজনুকে সমানভাবেই উত্তেজিত করে তোলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুলসুমের শান্ত বোধের কাছে তাদের পরাজয় মেনে নিতে হয়।

> কিন্তু কুলসুম তার স্তব্ধ স্বপ্নাবিষ্ট চোখদুটি মজনুর মুখের ওপর ন্যস্ত করে অতি আশ্চর্য প্রশান্ততায় তাকাল, তাকিয়ে একটু নড়ল-চড়ল বলে চুড়ি বাজল মৃদু ঠুনঠুন আওয়াজ করে। তারপর নিস্তব্ধতা। নতুন প্রশ্ন নিয়ে মজনু তাকাল কালুর পানে। কালু গলায় কেমন আওয়াজ করে উঠল।
> – কী হইল তোমাগো?
> কোনো উত্তর নেই। এবং এ-নিরুত্তর নীরবতার মধ্যে কুলসুমের চোখে হঠাৎ বন্যার মতো এল জাগতিক চাঞ্চল্য, তারপর ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠল তার দৃষ্টি।
> – তোমরা এমন কইরা চাও ক্যান? না, না, মোর ভয় করে – (পৃ. ২০)

দৃষ্টিভাষ্য সৃজনের এরূপ অর্কেস্ট্রাতুল্য বিন্যাসের দৃষ্টান্ত ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। উদ্ধৃতির শুরুতে কুলসুমের স্বপ্নাবিষ্ট চোখে প্রশান্তিময় দৃষ্টিপাত, মজনুর প্রশ্নবিদ্ধ চাহনি আর উদ্ধৃতির শেষাংশে কুলসুমের ভীত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি এবং সবশেষে তার ভয়ার্ত আকুলতাভরা জিজ্ঞাসা যেন মনুষ্যত্ব ও মানুষিক প্রবৃত্তির লড়াইকে চরম পর্যায়ে উন্নীত করে। ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রতিটি চরিত্রের কামবোধ, অসহায়ত্ব এবং হাহাকারকে দৃষ্টির অন্তর্ভেদী দ্যোতনায় উপস্থাপন করেছেন। কুলসুমের চোখ স্বপ্নাবিষ্ট হয়, ভয় পায় – অর্থাৎ, এত সংকটের ভেতরেও সে আরও বেশি করে জীবনমুখী হয়ে ওঠে। অপরদিকে মজনু যেন নিজের কামবোধকে নতুন করে অনুভব করে নিতে চায়। কুলসুমের অকপট আকুতির মুখোমুখি হওয়ার আগ পর্যন্ত সে মূলত প্রবৃত্তির নির্দেশিত পথেই হেঁটে চলেছে। গল্পকার আড়াল থেকে মনঃসমীক্ষণতাত্ত্বিক কৌশল অবলম্বন করে দৃষ্টিভাষ্যসমূহের মধ্যে এই ব্যবধান রচনা করেন এবং সমান্তরাল কতগুলো স্পেস তৈরি করে চরিত্রগুলোকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপন করতে চান। চরিত্রগুলো জটিল মনস্তাত্ত্বিক লড়াই শেষ করে শুদ্ধসত্তায় উত্তীর্ণ হয়, কুলসুমের শেষ পর্যন্ত স্বস্তি ফিরে আসে; যে অদ্ভুত স্তব্ধতা কুলসুমকে ঘিরে ছিল, গল্পের শেষ বাক্যে সেই কাষ্ঠ-নিস্পন্দতা মজনু এবং কালুকে গ্রাস করে।

৩

'খুনী' গল্পে রাজ্জাকের দৃষ্টিপাতের ভাষায় বিদ্যমান অস্তিত্বসংকটের বেদনা। গ্রামীণ কলহসূত্রে আকস্মিকভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে বহুদূর পালিয়ে যাওয়া রাজ্জাক হঠাৎই বৃদ্ধ দর্জি আবেদের কাছে আশ্রয় পায়। আবেদই তাকে নিজের হারিয়ে যাওয়া পুত্র মোমেন রূপে সবার কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়। উদ্বাস্তু রাজ্জাক গৃহীত হতে থাকে আবেদের পরিবারে, বিশেষ করে আবেদের জ্যেষ্ঠপুত্রের বিধবা জরিনার কাছে। নিজে থেকেই জরিনা ব্লাউজ সেলাই করে দেওয়ার অনুরোধের ছলে অতিসংগুপ্ত পথে রাজ্জাকের প্রতি যৌনতার ইঙ্গিতবাহী আমন্ত্রণ জানায়। দীর্ঘ পলাতক জীবন পেরিয়ে হঠাৎই যেন সব পেয়েছির দেশে হাজির হয় রাজ্জাক। কিন্তু হঠাৎ করেই প্রকৃত মোমেন ফিরে আসে এবং পুনরায় অনিশ্চিত উন্মূল এক জীবনে পা বাড়াতে বাধ্য হয় রাজ্জাক। এই সরল আকস্মিকতায় ভরা গল্পে দৃষ্টিপাতের ভাষা ওয়ালীউল্লাহ্‌ বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন। আবেদের পরিবারের সঙ্গে আপাতভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার কালে রাজ্জাকের চোখ দিয়ে পাঠক বারবার চারপাশের মানুষগুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে। জরিনার 'কেমন যেন দৃষ্টির' আকর্ষণে রাজ্জাক স্বপ্ন দেখে জরিনার বৈধব্যের রংহীন জীবনকে পুনরায় রঙিন করে তোলার; আবেদের বাড়ি পরিবার – এ সবকিছুর সঙ্গে নিজেকে একীভূত করার। এই প্রত্যাশা আর পূরণ হয় না তার, শূন্যদৃষ্টিতে আবেদের বাড়িটিকে দেখে নিয়ে সে পুনরায় নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে বাধ্য হয়:

> কিন্তু তার আগে-ই রাজ্জাক বাইরে চলে এল এবং এল চিরদিনের জন্য। বেরোবার আগে একবার সে দক্ষিণ দিকের ঘরের পানে তাকাল, দেখলে, দরজার কাছে পা মেলে জরিনা কাঁথা সেলাই করতে করতে হঠাৎ মোমেনের চেঁচামেচি শুনে বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তার পানে। (পৃ. ৩৪)

রাজ্জাকের দৃষ্টির শূন্যতা আর জরিনার দৃষ্টির বিস্ময়কে ওয়ালীউল্লাহ্ মিলিয়ে দিতে আগ্রহী হন। আবেদ দর্জির পরিবারে এসে দীর্ঘ পলাতক জীবনের ক্লান্তি মুছে ফেলতে চেয়েছিল রাজ্জাক। জরিনা ছিল তার জীবনের বাড়তি পাওয়া। কিন্তু এক মুহূর্তে সে হারিয়ে ফেলেছে সবকিছু। তার অনিকেত চাহনি যেন সব হারানোর বেদনায় উচ্চকিত, জীবন-গভীরে সম্প্রসারিত। রাজ্জাকের দৃষ্টিপাতে যেখানে হঠাৎ করে পেতে যাওয়া পরিবার আর দাম্পত্য জীবনকে ঘিরে চূর্ণস্বপ্নের হাহাকার, সেখানে এর পরবর্তী গল্প 'পাগড়ি'-তে রয়েছে স্থূলরুচি অনুভূতিশূন্য বৃদ্ধের বিবাহবিকার।

পক্ককেশ বৃদ্ধ খানবাহাদুর মোত্তালেব সাহেবের পুনরায় বিয়ের আয়োজন নিয়ে লেখা 'পাগড়ি' গল্পে মোত্তালেব সাহেব সবচেয়ে বেশি উপস্থিত থাকলেও তার মানসিক ভারসাম্যহীন স্ত্রীর অচেনা চাহনি বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তাদের কন্যার গভীর অনুভবের আশ্রয়ে মাতা-কন্যার সংযোগের আবেগপূর্ণ দৃষ্টিপাতের প্রসঙ্গ তাই বিশেষভাবে উল্লেখ্য:

> মায়ের চোখ নড়ে না; তাতে অবশেষে কেমন আবেশ জমে ওঠে। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়েই থাকেন। মেয়েটি হাতে সেলাইর কাজ নিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তবে মনে একটা দুর্দান্ত আশা-আনন্দ ঝড়ের মতো উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তার ইচ্ছা হয়, ছুটে গিয়ে মায়ের কোলে মুখ গুঁজে পুনর্মিলনের আনন্দে অবাধে কাঁদে। কিন্তু সে নড়বার শক্তি পায় না। তবে এই সময়ে তার মা বিস্তীর্ণ নীরবতায় তীক্ষ্ণ দাগ কেটে হেসে ওঠেন। সে-হাসি অতি কর্কশ হলেও তা অচেতন বলে দুনিয়া-ছাড়া মনে হয়। (পৃ. ৭৫)

মার্বেলের মতো ভারী চোখের অধিকারী মোত্তালেব সাহেবের পাথুরে দৃষ্টিতে তার সন্তান ও অপ্রকৃতিস্থ স্ত্রীর এই চাহনি, আবেগ কোনো আবেদন তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। বৃষ্টিতে ভিজে দ্বিতীয় বিয়ে সম্পন্ন করে বাড়িতে ফেরত আসেন তিনি; ঝড় বাদল স্পর্শ করে না কেবল তার পাগড়িটিকে। এক প্রকার আয়োজনসর্বস্বতার দ্যোতনায় ব্যঙ্গাত্মক এই গল্পে বিশুষ্ক পাগড়ির প্রসঙ্গ এনে লেখক মূলত এই দ্বিতীয় বিয়ের নিষ্ফল পরিণতিকেই নির্দেশ করেন। আর সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের বিপ্রতীপে তার প্রথমা স্ত্রীর অচেতন, শূন্য কর্কশ হাসি বিদ্রূপ হয়েই রয়ে যায়।

'কেরায়া' গল্পে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের হেলুসিনেশন-আবিষ্ট দৃষ্টির শূন্য প্রকাশ লক্ষ করা যায়। গল্পটি মূলত শোষিত শ্রমজীবী শ্রেণির মানবিক বোধের শৈল্পিক বিন্যাসে ঋদ্ধ। কেরায়া থেকে বঞ্চিত হয়েও মানবিকতার ডাকে সাড়া দিয়ে মাঝি মৃতপ্রায় বৃদ্ধের শেষ ইচ্ছা পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই সমান্তরালে, আসন্ন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমাণ বৃদ্ধের মনোজগৎকে লেখক উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হন। –

> বুড়োটি আবার চোখ খুলে তাকায়। ছেলেটি তখন শুয়ে পড়ে ঘুমে বিভোর আচ্ছন্ন। হঠাৎ একটা তীব্র তাগিদ বোধ করে বলে দ্রুত কণ্ঠে ডাকে, বাপজান, বাপজান।
> সে জানে না যে তার কণ্ঠে কোনো আওয়াজ হয় না। উত্তর না পেলে এবার সে ভাবে,

> সে স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্নের কখনো শেষ নাই; স্বপ্ন কারো পিছু ছাড়েও না। এতিম ছেলেটা মরে আছে। যেমন রাতটি, নিচে কাঠের পাটাতন, বাইরে হাওয়া।
> এবার চিরদিনের জন্য বুড়ো চোখ নিমীলিত করে। (পৃ. ৮০-৮১)

বৃদ্ধের অন্তিম চাহনির এক পরাবাস্তববাদী বিবরণ লেখক উপস্থাপন করেন। যে মৃতুবরণ করে, তার দৃষ্টিতে চারপাশের সবকিছুও তার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে। রবীন্দ্র-দর্শনের প্রচ্ছন্ন প্রভাবে ওয়ালীউল্লাহ্ এই গল্পে মৃতপ্রায় মানুষের দৃষ্টিকে ব্যবহার করে মৃত্যুকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছেন। তাই বৃদ্ধলোকটি নিজে যতক্ষণ বেঁচে আছে, ততক্ষণই তার সাপেক্ষে চারপাশটা বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে নৌকার সেই বালক সহকারী, কিছুক্ষণের বিভ্রমে যার সঙ্গে বৃদ্ধটি তার মৃত সন্তানের মিল খুঁজে পেয়েছিল। লক্ষণীয় মৃত্যুর আবেশ জড়ানো মুহূর্তেও বৃদ্ধ কোনো স্থায়ী বিভ্রমে আক্রান্ত হয় না। বরং ধীরে ধীরে সে তার সকল বিভ্রমের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দৃষ্টিকে এক অনন্ত অন্ধকারের অভিমুখে প্রবাহিত করে।

দৃষ্টিপাতের ভাষার এই অভিনব ব্যবহার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বিভিন্ন রচনায় অনুসন্ধানযোগ্য। বর্তমান প্রবন্ধ কেবল কয়েকটি গল্পের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে দৃষ্টিপাতের ভাষার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ করা যেতে পারে, ‘গ্রীষ্মের ছুটি’, ‘ছায়া’, ‘দ্বীপ’, ‘না কান্দে বুবু’-সহ বেশ কয়েকটি গল্পের কথা যেখানে, চরিত্রসমূহের চোখের ভাষার অনির্বচনীয় প্রান্তসমূহ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণযোগ্য। ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস এবং ছোটগল্পের সমন্বিত বিশ্লেষণের সূত্রে আরও বিস্তৃত পরিসরে এই বিষয়ে গবেষণার সুযোগ বিদ্যমান।

## 8

বিভিন্ন ছোটগল্পের পাঠবিশ্লেষণসূত্রে বলা যায় যে, দৃষ্টিপাতের ভাষা মূলত উপস্থিতির কথা বলে। এই উপস্থিতির অংশ হতে পারে কোনো আবেগ, কোনো প্রত্যাশা কিংবা কোনো পরিকল্পনা বা এরকম আরো অনেক কিছু। কখনো এক বা একাধিক তলে অবস্থান করে চরিত্রসমূহের ব্যবহৃত দৃষ্টিভাষ্য। সব মিলিয়ে এই দৃষ্টিভাষ্য অনিবার্যভাবে সৃষ্টিশীল এবং চরিত্র এবং আখ্যানের নিগূঢ় চেতনাবাহী। ওয়ালীউল্লাহ্ প্রায়শ এই দৃষ্টিপাতের ভাষা ব্যবহার করে অনুভব আর বাস্তবের সমন্বয় ঘটান। গল্পের চরিত্রের কোনো বিশেষ চাহনিকে তিনি উপমিত করেন নানা আবেগ এবং রঙের দ্যোতনায়; আবার এর সঙ্গে তিনি বাস্তবকে কৌশলে মিলিয়ে দিয়ে আখ্যানের গতিধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট হন। ফলে, দৃষ্টিপাতের ভাষা যুগপৎভাবে কল্পনা ও বাস্তবকে ধারণ করে। এই ধারণের প্রক্রিয়াটি দৃশ্যমান/অদৃশ্য; সংগুপ্ত/প্রকাশিত; অন্তরঙ্গ/বহিরঙ্গ প্রভৃতি বাইনারি ধারণার জটিল সংশ্লেষের মধ্য দিয়ে কার্যকর থাকে। আমু কিংবা কুলসুমের দৃষ্টিভাষ্যে এরূপ একাধিক বাইনারির বিস্ময়কর সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়। দৃষ্টিভাষ্যের এই সমন্বয় প্রক্রিয়া চূড়ান্তভাবে লেখক-কথক-চরিত্রের চিন্তাজগৎ ও অনুভবপুঞ্জের প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিবিম্ব তৈরি করে। দৃষ্টিপাতের ভাষা দিয়ে সৃষ্ট এই প্রতিবিম্বগুলোর মধ্যে বৈপরীত্য থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক যা মূলত, সমাজদেহে বিদ্যমান হেটেরোটোপিয়াকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্র তৈরি করে (Thacker,

2009)। ফলে, দৃষ্টিভাষ্য এই পৃথিবী থেকেই উপাত্ত নিয়ে গঠিত হয়, আবার সেই সূত্রেই পার্থিব অনুষঙ্গকে নতুনতর প্রকরণে ব্যাখ্যা করে। এতে করে, চরিত্রের চাহনি কখনো কখনো অস্পষ্টতা যে তৈরি করে না, তা বলা যাবে না। আবার, সেই চাহনিতে অভিব্যক্ত ভাবনা কোনো চরিত্রের অন্তর্গত অনুভবকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দৃষ্টিপাতের ভাষার অভ্যন্তরীণ সংকটের কারণেই এতে এক প্রকার অনতিক্রম্য অস্থিতিশীলতা বিদ্যমান। এই অস্থিতিশীলতাকে আড়াল করা হয় শৈল্পিক উপস্থাপনকৌশলের সাহায্যে। অন্য কথায় এই অস্থিতিশীলতাকেও পরিবর্তমান নান্দনিকতার অংশ বিবেচনা করা হয়। ফলে, ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পে দৃষ্টিপাতের ভাষা কল্পনা ও বাস্তবকে একত্রে ধারণ করতে গিয়ে অস্থিতিশীল হলেও তা নিজ শক্তিতেই শিল্পগুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে। তাঁর ছোটগল্পে চরিত্রসমূহের চোখের ভাষা নিয়োজিত থাকে আখ্যানের সংকটের ঘনীভবনে; আবার একইসঙ্গে সেই সংকটের নিরসনে। আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণ মেনে এক সুগভীর অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এই দৃষ্টিপাতের ভাষা (Danius, 2002)। ওয়ালীউল্লাহ্ মূলত আধুনিক মানুষের জীবনের জটিলতাকে উপস্থাপনের একটি কৌশলরূপে ব্যবহার করেন চরিত্রের বহুমাত্রিক চাহনির ব্যবহারকে। পাঠককে তিনি অনুপ্রাণিত করেন, চরিত্রের মনের গভীরে কী ভাবনাপুঞ্জ কল্পনা ও বাস্তবের মিথস্ক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছে তা বোধ দিয়ে অনুভব করার জন্য। ফলে, পাঠক আরো বেশি সম্পৃক্ত হয় চরিত্রের সঙ্গে; চরিত্রে বিন্যস্ত প্রতিটি আবেগ, অনুভব, রংকে পাঠক তখন নিজস্ব উপলব্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এভাবে, পাঠকের সঙ্গে চরিত্রগুলোর দূরত্ব তিনি কমিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। আবার, এই একই উপকরণ কখনো কখনো তিনি ব্যবহার করেন পাঠকের চিন্তাজগৎকে উদ্দীপিত করতে। এক্ষেত্রে, চোখের ভাষা হয়ে ওঠে শূন্য, ব্যাখ্যার চেয়ে অব্যাখ্যাত অনির্বচনীয় কতগুলো সূত্র কেবল তিনি পাঠককে দিয়ে যান। পাঠকেরা তখন নিজ দায়িত্বে অনুসন্ধানকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ফলে, এক রহস্যময় প্রচ্ছন্ন দৃষ্টিভাষ্য পলিফোনিক বৈশিষ্ট্যে প্রত্যেক পাঠকের চিত্তে অভিনব রসোপলব্ধি জাগিয়ে তোলে । প্রবন্ধে আলোচিত গল্পসমূহের প্রবণতা বিবেচনা করেই মূলত উপর্যুক্ত বক্তব্য সন্নিবেশিত হয়েছে। দৃষ্টিপাতের ভাষা যে চূড়ান্তভাবে বিমূর্ত আবেশসঞ্চারী তার শেষ দৃষ্টান্তটি গ্রহণ করা যেতে পারে ‘না কান্দে বুবু’ গল্প থেকে। ভাষার কাঠামোকে সম্পূর্ণরূপে গৌণ করে কেবল অনুভবস্পর্শী দ্যোতনায় রসসম্পৃক্ত করার এক বিস্ময়কর উদাহরণ এই গল্পটি । আবেগ পরিবৃত বুবু কীভাবে বীত-আবেগ হয়ে উঠল সেই রহস্য কিন্তু লেখক উন্মোচনের কোনো দায় অনুভব করেন না; তা প্রত্যেক পাঠকের জন্যই আনকোরা অবস্থায় রয়ে যায়। আর এই সমাধানশূন্য পরিণতিকেও লেখক পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেন সেই দৃষ্টিভাষ্যের প্রয়োগ ঘটিয়েই:

> আফতাবের কেমন সঙ্কোচ হয়। সে বুবুর পানে তাকায় একটু, কিন্তু আবার চোখ ফিরিয়ে নেয়। ঘরের মধ্যে ছাতের খুঁটি ধরে বুবু দাঁড়িয়ে থাকে নিঃশব্দে। (পৃ. ৩০৮)

আফতাবের সঙ্কোচ, বুবুর অভূতপূর্ব নীরবতা – এর যত কারণ, তার সবটুকু উদ্ধারের ভার পাঠকের ওপর ন্যস্ত করে ওয়ালীউল্লাহ্ গল্পের সমাপ্তি ঘোষণা করতে উদ্যত হন।

তাই বুবুর দিকে একটু তাকিয়ে আফতাবের চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার মাঝে হয়ত লুকিয়ে থাকে সম্পর্কের অব্যাখ্যাত ব্যবধান, জটিল সময়পরিক্রমা, আবেগ আর বাস্তবকে মেলাতে না পারার ব্যর্থতা। ওয়ালীউল্লাহ্‌ এভাবে দৃষ্টিভাষ্যের সুপরিকল্পিত ব্যবহার করে তাঁর গল্পগুলোকে আরো বেশি অনুসন্ধানসক্ষম করে তোলেন ।

**৫**

দৃষ্টিপাতের ভাষা সৃজন মূলত কথাসাহিত্যিকের রসপোলব্ধিকে চরিত্রায়ণ পরিকল্পনা ও ন্যারেটিভের সঙ্গে সমন্বিত করে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগল্পগুলোয় এই সমন্বয় কতটা ব্যঞ্জনাপূর্ণ ও দার্শনিক গভীরতা-সঞ্চারী, তা-ই বর্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে উপস্থাপিত হয়েছে । প্রসঙ্গত, তাঁর ছোটগল্পে ব্যবহৃত দৃষ্টিভাষ্যের ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সুযোগও বিদ্যমান। অর্থাৎ, বিভিন্ন চরিত্রের চোখের ভাষা কিংবা চাহনিকে তুলে ধরতে গিয়ে লেখক যে ধরনের শব্দ ব্যবহার করেন কিংবা পদবিন্যাস ও বাক্য গঠন করেন, সেগুলোর বিশেষত্ব অনুসন্ধানও গবেষণার একটি আকর্ষণীয় ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হতে পারে। একইসঙ্গে, বিশ্লেষিত হতে পারে, এদের বাগর্থগত ও প্রয়োগতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও অনুষঙ্গসমূহ। যে গভীর সাহিত্যবোধ, আন্তর্জাতিক চেতনা ও কালোত্তীর্ণ জ্ঞানবিশ্বকে ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে সমন্বিত করেছিলেন, তার ব্যাপ্তিকে বিবেচনায় নিয়েই বস্তুত বিভিন্ন ছোটগল্পের আখ্যান ও প্রকরণ সংশ্লিষ্ট বিশেষত্বসমূহ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

**উল্লেখপঞ্জি**

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১৭। গল্পসমগ্র, হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত (ষষ্ঠ সংস্করণ), প্রতীক, ঢাকা ।

ভীষ্মদেব চৌধুরী, ২০১৩। ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী: একটি জনান্তিক পর্যবেক্ষণ’, *জনান্তিকের মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

Foucault, M., 1986. ‘Of other spaces’*, Diacritics,* 16.1 (Spring), pp. 22-27

Thacker, A., 2009. *Moving through modernity: Space and geography in modernism,* Manchester University Press, Manchester.

Danius S., 2002. *The Senses of Modernism-technology, perception*, *and aesthetics,* Cornell University Press, New York.

Zamir, T. 2012. *Double Vision: Moral Philosophy and Shakespearean Drama*, Princeton University Press, Princeton.